Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 97–102
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

'অশ্বচরিত' : সময়ের মেরুকরণে জনজীবন

আঁখি সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: ankhis13@gmail.com

Keyword
ভানুচরণ, কন্থক, রাজকুমার গৌতম, লায়কানখাস, মরুভূমি, পোখরান, মদরঞ্জি

Abstract

Discussion

বিশ শতকের শেষের তিন দশকে উপন্যাসের বিষয় ও শৈলীতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সময়ের উপন্যাসে মূলত সময়ের অস্থিরতা নানা ভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে আঙ্গিকে নানা ভাবে বদল হয়েছে। সেইরকম খন্ডসময়ের সামাজিক বয়ান থেকে উঠে আসা উপন্যাস হল ২০০১ সালের বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত অমর মিত্রের "অশ্বচরিত"। এই উপন্যাসে সময় শুধুমাত্র বর্তমানে সীমাবদ্ধ না হয়ে ভবিষৎ অতীতের পরিচায়ক হয়ে উঠছে। ফলে আমরা অনায়াসে খণ্ড ঘটনা গুলিকে সময়ের চিহ্নায়ক হিসাবে বুঝে নিতে পারি। সেই সাথে উঠে আসে বিভিন্ন জন সংগ্রামের কথা। ফলে পূর্বের উপন্যাসের সংজ্ঞা আর থাকছে না। উপন্যাসের শৈলীর পরিবর্তন সম্বন্ধে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> *"এ সম্পর্কে দ্বিমত নাই যে প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রকরণ জুড়ে থাকবে সমকালীন সমাজের বয়ান। ঘটনা হবে এমন যাকে সময়ের চিহ্নায়ক বলে আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারব।"* [১]

"অশ্বচরিত" উপন্যাসে বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে সমুদ্র পাখি হোটেল মালিকের ঘোড়াটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সেই সূত্র ধরে ছন্দক ভানুচরণ দাস ভ্রাম্যমান হয়ে খোঁজার মাধ্যমে নানা মানুষের জীবন কথা উঠে এসেছে। সেই সাথে কপিলাবস্তুর রাজকুমার গৌতম ও তার সারথী, ঘোড়ার কথা উঠে এসেছে। এ যেন আমাদের বর্তমান থেকে অতীত প্রাগৈতিহাসিক সময়ে নিয়ে যায় সাথে সাথে ভবিষৎও বাদ যায় না। আমাদের মায়া বাস্তব জগতে নিয়ে যায়। উপন্যাসের প্রচ্ছদপটে আভাসিত উপন্যাসের মূল ভাবনা–

> *"কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের মহানিক্রমণের পর শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়া কন্থক আর শূন্য হৃদয় সারথী ছন্দক পাশাপাশি বেঁচেছিল এতকাল। বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে ঘোড়াটি নিরুদ্দেশে গেল সারথীকে ফেলে। সারথী সেই ঘোড়াকে খুঁজতে বঙ্গোসাগরের মিলনস্থলে জেগে ওঠা চরভূমিতে, যেখানে পলাতক ঘোড়ারা যায় স্বপ্নতাড়িত হয়ে।"* [২]

সেই পলাতক ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে ভানু চলে যায় লায়কানখাসে অনন্ত নুনমারার কাছে । কথায় বলে, নুন না দিলি নুন পাবিনি। লবণ মানে শ্রম। সারাদিন রোদে রোদে পুড়ে পুড়ে সুমদ্রের লবণ বার করে এনে সেই সঙ্গে নিজের দেহের নুন মিশিয়ে তবেই অর্থ রোজগার হয়। পূর্ণিমা -অমাবস্যায় জোয়ারের জল লায়কানখাস অবধি আসে,

সেই নোনাজল ধরে রাখা হয় বড় বড় গর্তে কেননা শীতের সময় সুমদ্রের জল লবণে ভারী হয়। এই ভাবে তাদের জীবন -জীবিকা অতিবাহিত হয়। অলঙ্কারপুরের লবণমারাদের অনেকেরই জমি আছে, লবণটা তাদের কাছে অতিরিক্ত আয়। সেই জমিটুকুও নেই অনন্তের। শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় অনন্ত হোটেলের পঞ্চম ঠাকুরের প্ররোচনায় নিজের একমাত্র মেয়ে কুন্তিকে প্রেম মদনানির কাছে বেঁচে দেয়। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে পঞ্চম ঠাকুর তাদের প্রতারিত করে। কলকাতা শহরে কুন্তিকে দেখতে এসে ভানুর নিজের স্ত্রী ফুলরানি ও খোকার কথা মনে পরে যায়। এ যেন ভানুদাসকে নিজের অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করায়। শেষপর্যন্ত কুন্তিকে তার মা-বাবা ফিরে পাইনি। এখানে হতাশার আলো দেখা গেলও পরবর্তীতে অনন্তের স্ত্রী সরস্বতীর সন্তান ধারণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আশার আলো দেখিয়েছেন।

১৯৮২ সালে "শিলাদিত্য" পত্রিকায় "বিভ্রম" নামে প্রকাশিত উপন্যাসে তাঁর এই উপন্যাসের বীজ নিহিত রয়েছে। যার বিষয়বস্তু ছিল সমুদ্রতীর ও নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়া। লেখক এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন ১৯৮০ সালে কর্মসূত্রে তাকে প্রায় একবছর একটি হোটলে একা থাকতে হয়। সেই সময় ভানুদাস নামে একজন লোক তার ঘোড়া অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। তিনিও মাঝে খুঁজতে বেড়াতেন। কিন্তু ১৯৯৮ সালে বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে পোখরানে পরমাণু বোমার সফলভাবে পরীক্ষা করানো হয়। রাষ্ট্রীয় প্রভুরা একে "Buddha Smiles" বলে অভিহিত করেছেন। মারণ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করা "বিভ্রম" পাণ্ডুলিপিকে "অশ্বচরিত"-এ পরিণত করে। এ সম্পর্কে বলেছেন-

> *"বিভ্রম' নিয়ে আমি নিজেই বিভ্রমে ছিলাম তাই এটিকে মলাটে আনতে পারিনি।। ১৯৯৮-এ পরমানু বিস্ফোরণ হয়। ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা খেলনার মতো পাঁচটি আর সাতটি পরমাণু বোমা ফাটিয়ে নিজেদের জাহির করলেন। যেন এ পাড়ার মাস্তান পাঁচটি বোমা ফেলল। মাস্‌ল দেখাল, ও পাড়ার তা দেখে সাতটি বোমা ফাটিয়ে মাস্‌ল দেখাল।"*[৩]

অশ্ব ঘোষের "বুদ্ধচরিত" থেকে রাজকুমার গৌতমের ঘোড়া কন্থক আর সারথী ছন্দক বাস্তব ও অবাস্তবের সময় ও পরিসীমা মিশে যায় এই আখ্যানে। উপন্যাসের প্রথমে বলা হয়–

> *"ছিল পক্ষিরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানু দাস হয়ে গেল ছন্দক।"*[৪]

ঔপন্যাসিক অমর মিত্র আমাদের সময় ও সমাজের যে অংশ আমরা দেখতে পাই না তা আমাদের দেখান। বিশ্বপুঁজিবাদ নিজেদের সুবিধার্থে মানুষের কাছে ছদ্মসত্য তৈরি করে, আমাদের চোখ বন্ধ করে দেয় তা লেখক নিরুদ্দেশ ঘোড়ার অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। অশ্বের খোঁজ করতে করতে ভানুদাস চলে আসে মীরগোদার গৌরমোহন মদরঞ্জি ও তার স্ত্রী কোকিলার কাছে। মদরঞ্জিতে অশ্বের ছবি দেখে তার মনে হয় কোকিলা তার অশ্বকে কুহক করেছে। পরবর্তীতে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যায়। কোকিলা বধূকে আচ্ছন্ন করে ঘোড়াটি তাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে মদরঞ্জির উপর, নিজের বেগবান রূপটি প্রতিষ্ঠিত করেছে, যাতে কেউ না ধরতে পারে ঘোড়াটি পালাচ্ছে। মনুষ্যতর প্রাণী ধরতে পারে প্রকৃতিতে কোথায় কী হচ্ছে। পৃথিবীর আকাশ, মাটি ,নদী, সাগর, অন্ধকার,জোৎস্না যা কিছু ভগবান দিয়েছিল ঘোড়াটির জন্য তার কাছে এক মুহূর্তে সব বিষময় হয়ে ওঠেছে। সে বুঝতে পারে চাঁদের আলোতে তার কাছে মরুভূমির তেজস্ক্রিয়তা ভেসে এসেছিল তাই সে পালিয়েছে, আর সে পালানোর সূত্রটি রেখে গেছে কোকিলার মদরঞ্জিতে।

ভানুদাস ছিল একজন সামান্য জুটমিলের শ্রমিক। সমুদ্র ছিল তাঁর বড় প্রিয়। কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর ভানুদাস শ্রীপতি মাইতির ঘোড়ার একজন তত্ত্বাবধায়ক রুপে নিযুক্ত হয়। সে শ্রীপতি মাইতির ঘোড়াকে কন্থক আর নিজেকে ছন্দক বলে পরিচয় দেয়। তারই কল্পনার সূত্রে উঠে এসেছে আড়াই হাজার বছর আগের মহর্ষি গৌতমের পরিবার -পরিজন ছেড়ে যাওয়ার কাহিনী। তার সাথে উঠে এসেছে তার কন্থক ও ছন্দকের ইতিবৃও। অশ্বচরিত শুরু হয়েছে "বুদ্ধচরিত"-এর অষ্টম সর্গের চতুর্দশ শ্লোক দিয়ে। পুনরায় কুমার ফিরে এসেছেন ভেবে রাজ্যের নারীরা সকল গবাক্ষদ্বারে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অশ্বকে শূন্যপৃষ্ঠে ফিরেছে দেখে তাঁরা গবাক্ষ রুদ্ধ করে আবার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। এই ঘটনাটি ভানু দাসের মাধ্যমে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক "ছন্দক আর কন্থকের কথা" প্রবন্ধে বলেছেন-

> *"ভানুচরণ নিজের পরিচয় দেয় ছন্দক বলে। বলে বেড়ায় হারানো ঘোড়াটি কন্থক। ...সে যেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ। আরও পূর্বপুরুষের কেউ। এ উপন্যাসে প্রাচীন ভারত এসেছে ভানুদাসের স্মৃতিতে।"*[৫]

পোখরানে পরমানু বোমা পরীক্ষামূলক পরীক্ষা করা হয় বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে, আর ঘোড়াটি সেই দিনই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রাষ্ট্রপ্রভুরা এই ঘটনাকে Buddha smiles বলেন। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র গৌতম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিলেন। তাঁরই নামে মারণাস্ত্র তৈরি করে রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের জাহির করতে চেয়েছে। এ সম্পর্কে ভানুর মনে হয়—

> *"আসলে কন্থক তো জানত মৃত্যুকে জয় করতে বেরিয়েছেন কুমার, রাজপুত্র মৃত্যুকে নিঃশেষ করতে তাঁর অশ্বটিকে শূন্য পৃষ্ঠ করে রেখে গিয়েছিলেন, এখন মরণের ছায়া দেখে সে কি কুমারের সন্ধানে গেল, তা না হলে গেল কোথায়, এ-মরণে কি কুমারেরও নিস্তার নেই?"*[৬]

ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য, কিন্তু বহু বছর পেরিয়ে গেলও খাদ্য- বস্ত্র-বাসস্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবহেলিত হয়। সেখানে ক্ষমতাশীল নেতারা বুদ্ধের নির্বাণ লাভকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেন। তাইতো কুমারেরও নিস্তার নেই। পরমাণু বোমার পরীক্ষা দুই সম্প্রদায়কে নিজেদের পরস্পের প্রতি ঘৃণাকে আরও বেশি জাগ্রত করে তোলা হয়। ভানু দাস কন্থকের খোঁজ করতে করতে ভীমাপুরের নায়েব রামচন্দ্রের কাছে আসে। সেখানে এসে মহাপাত্রপুর, দে-পাল, কুসমাড় জমি অধিগ্রহণের করুণ কাহিনী শোনে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই অঞ্চলগুলোতে একসাথে জমি নেওয়া হয়নি, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা দপ্তর এমনটি করতে পারে। তাই দে-পালের যে সব জমি ছিল বালিয়াড়ি এখন তা কৃষিযোগ্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে বলা হয়—

> *"পঁয়ত্রিশ বছরে বেশ কয়েকটি নারকেলকুঞ্জ তৈরি হয়ে গিয়েছিল দে-পাল-এর অংশে। ওটি ছিল চাষাপাড়া। যারা কোনোদিন নিজস্ব জমির মুখ দ্যাখেনি তারা জমি পেয়েছিল ওখানে।"*[৭]

একালের কেয়াবনে আর বন্যগুল্মে এখন তাদের ঘরবাড়ি, ধানজমি, তরমুজের ক্ষেত, চিনাবাদাম ক্ষেত, নারকেল বন, পানের বরজ, কাজুবাদামের হাল্কা বন গড়ে উঠেছে। তারা জমির লিজ নিতে চেয়েছিল কিন্তু তা নামাঞ্জুর হয়ে যায়। সরকার পক্ষ তাদের উচ্ছেদ করতে এলে সংঘর্ষ বাধে। তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সেই ঘটনার পর পুলিশ রাতে ফিরে এসে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> *"সেটা ছিল ফাল্গুনের শেষ। রাতে শীত পড়ে, দিনে গরম। ধানমাঠ খা খা। তরমুজ ফলেছিল বালিজমিতে। খুব বড় হয়নি তখনো।তবু ক্ষেত পাহারায় ছিল কিছু মানুষ। পুলিশ ঢুকল বড় বড় টর্চ হাতে। সঙ্গে লোক ছিল। তারা ধর্ষণের রকম জানে। পুলিশ নিজে ধর্ষণ করেনি। তারা করেছিল। তবে তাদের ভিতরে প্লেন ড্রেসের পুলিশ ছিল কি না কে জানে? সমস্ত রাত ধরে তছনছ করে পুলিশ সব কিছু। খুব সাজানো গ্রাম ছিল খাস দে-পাল ! সমস্ত রাত মত্ত হাতির মতো তারা ভেঙ্গেছিল সব কিছু।"*[৮]

সে রাতে সমস্ত পল্লীটা বারবনিতা পল্লীর মতো ভেবে বসেছিল পুলিশ- ঠিকেদারের লোকেরা। পাণ্ডব কুমারের স্ত্রী সুভদ্রা উপর সেই রাতে তারা পাশবিক অত্যাচার চালায়। শেষ পর্যন্ত সুভদ্রা "দে-পাল রক্ষা সমিতি"র কাছে নিজের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের কথা বলে। এরপর তার স্বামী পাণ্ডব কুমার তাকে ছেড়ে দেয়। নায়েব রামচন্দ্র ভানুদাসকে বলে—

> *"তিন তিনবার ধরিছিলা উহারে। ....পুলুশ কহিছিলা যদি শোরগোল তুলে সুভদ্রা, আবার উহারে নষ্ট করিবে, তখুন সুভদ্রা চুপ করি রহিলা।"*[৯]

তারা জানত তাদের অবরোধকে নারীর উপর অত্যাচার করে দমানো যাবে। তাই তারা এই পথ বেছে নেয়। শ্রীপতিকে লুকিয়ে সুভদ্রাকে নায়েব রামচন্দ্র আশ্রয় দিয়েছে। ভানুর কাছে তার বসবাসের যুক্তি খাড়া করেছে। মহামাত্রপুর, দে-পাল, কুসমাড় গ্রামের দিকের জ্বলন্ত আকাশ বদলে দিয়েছে রামচন্দ্রকে।

সরকার প্রকল্পের জন্য যে কোনো সময় জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। এ সব অঞ্চলে রকেট উৎক্ষেপণের জন্য জমি নেওয়া হয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নের প্রতিবাদ এ উপন্যাসে লেখক করেছেন। মূলত ওড়িশ্যার বালেশ্বরে রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করার কথা বলা হয়। সাধারণ মানুষ জানেই না কেন জমি তাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে। লেখক এখানে দেখাতে চাইছেন দেশের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া মানে দেশের সামগ্রিক উন্নতি নয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> *"ওই রকেটে করে সরকার বোমা পাঠাবে শত্রুর দেশে। শত্রুর দেশ কোন্‌টা? পাকিস্তান হবে। চীন হবে। ভারত ছাড়া সবই ভারতের শত্রু। তার মানে ভারতের লোক ছাড়া সবাই ভারতের লোকের শত্রু। তাই বা কী করে হয়? ভারতের লোকের ভিতরেই কত শত্রুতা, কত শয়তানি! এই যে বসে আছে সুভদ্রা, একে নষ্ট করেছে কে? ধ্বংস করেছে কে? ঠিকেদারের লোক। সে কি অন্য দেশের লোক?" আবার সুভদ্রা যখন বলে "কেনে নয় কহ দেখি ভানুবাবু, আকাশ পুড়ানোয় মোদের কী লাভ?* [১০]

এ যেন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ক্ষমতাধর মানুষেরা সবসময় দুর্বলদের উপর নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে, বিশেষ করে নারীদের উপর।তাই তো সুভদ্রার মনে প্রশ্ন জেগেছে এই অস্ত্রের পরীক্ষা শুধুমাত্র শত্রু দেশকে পরাজিত করার জন্য।

সত্যি তো আমাদের ভাবায় এ সব কি আদৌ আমাদের উন্নতির জন্য? সত্তর পরবর্তী লেখক উপন্যাসের পুরনো ধাঁচে নিজেদের বেঁধে রাখতে চান না। অশ্বচরিত উপন্যাসে তাই ফুটে উঠেছে। দেশের উন্নতির নাম করে সাধরণ মানুষের উপর অত্যাচার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বীজ যখন দেশের যুব শক্তিকে গ্রাস করে তখন তা বিধ্বংসী রূপ নেয় তার প্রতীক সতীশ গিরি। অর্ধ-উন্মাদ সতীশ তার পিতাকে শিক্ষা দেবার জন্য বিষ দিয়ে হত্যা করে ঘোটনকে। যার গর্ভে ছিল কন্থকের সন্তান। সে বিশ্বাস করে যুদ্ধ না হলে দেশের তথা মানুষের উন্নতি সম্ভব নয় । সে ঘুড়িটার মৃত্যু কারণ হিসাবে বলে দাঙ্গায় কত মানুষ মারা গেছে। সতীশের কাছে মনে হয় ঘোড়ার মৃত্যু "ইটা একটা প্রতীকী"। আর সতীশের পিতা নগেন এর মধ্যে ইতিহাসের ছায়াপাত দেখতে পান-

> *"এ তো ঘুড়ী মরিছে, দাঙ্গায় মানুষ কি কম মরিছে, আবার মানুষ মারার ইঙ্গিত হিলা ঘুড়ীটার মরণ, কতখানি রোষ, কতখানি হিংসা মাথার ভিতরে ঢুকি গিইছে কহো দেখি, দিনা দিনা তা আরও বাড়বে ভানুবাবু, যত অভাব তত হিংসা, অভাবী মানুষের ভিতর হিংসা জাগানোর খেলা চলিছে।"* [১১]

ঔপন্যাসিক অমর মিত্র পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে অশ্বচরিত উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কারগিল যুদ্ধ, বুদ্ধের হাসির দ্বারা সরকার অপুষ্টি, দারিদ্র্য, বেকারত্বকে আড়াল করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লেখক করেছেন। সমকালীন ভারতবর্ষের চালচিত্র-এর মুখ ও মুখোশ চিএ তুলে ধরেছেন। ভানু নিখোঁজ কন্থকে খোঁজার যাত্রাপথে শ্রীপতি মাইতি, মধুমিতা মাইতি, ভারতী চৌধুরী, পঞ্চম ঠাকুর, অনন্ত নুনমারা, সরস্বতী, কুন্তি, কোকিলা, গৌরমোহন, শিবরাম, উষা, ফ্রেদরিক, পরি, বেংগা, রামচন্দ্র, সুভদ্রা, পাণ্ডব কুমার, প্রেম মদনানি প্রমুখ মানুষের জীবন যাত্রার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতাপের চেহারা, অর্থের অসম বন্টন তার কুফল তুলে ধরেছেন। জীবনান্দের ভাষায়-

"মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতার ভোর?" [১২]

আখ্যানের শেষে এসে সময়ের নিরিখে মনুষ্যতর অশ্বই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কন্থকের কাহিনী আমরা তার মুখ থেকেই শুনতে পাই। বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের পর এক পশলা বৃষ্টি আর পূর্ণিমার জোৎস্না-স্নাত আকাশ তার মনে বিভ্রম জাগিয়েছিল। একই দিনে দুই ঋতু তার মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে, তার থেকে সে বেরতে পারেনা। শেষে ভুল বুঝতে পেরে সে ফেরে দীঘার পথে। কিন্তু এবার পথ ভুল হয়। জনপদে পৌঁছে সে ভেবেছিল ঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। ঠিক সেই সময় কিছু যুদ্ধবাজ মানুষ তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বা যবনের ঘোড়া ভাবতে থাকে। তাদের চোখে যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বলজ্বল করতে থাকে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে ছুটতে ছুটতে থাকে। সে হয়ত ছুটতে ছুটতে পোখরানের মরুভূমিতে পৌঁছে যায়। তার গায়ের রোম খসে পড়তে থাকে, কেশর পুচ্ছ পুড়ে ছাই হতে থাকে। সে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু তার জিভ বেরিয়ে আসে তেজস্ক্রিয় বাতাসে। সে ধরতে পারে কালো আগুনের সমুদ্রে সে ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষবারের মতো দৌড়তে গিয়ে উল্টে পড়ে যায় বালির সমুদ্রে, যে সমুদ্রে জল নেই। অন্ধ চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোতে থাকে, এই হিরোসীমায় ওই জল ব্যতীত আর কোথাও জলের চিহ্ন নেই। এ সম্পর্কে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন –

> *"উপন্যাসে সমাপ্তি বিহীন উপসংহারে অন্ধ ঘোড়া যেন হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় কুশীলব। মহাসময় ও খণ্ড সময়ের ব্যবধান মুছে যাওয়াতে ভাষায় ছড়িয়ে পড়ে পরাবচনের দ্যুতি। ...আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে পর্যন্তকে জাগিয়ে দেয় অশ্বচরিত-এর কেন্দ্রীয় আধেয়, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপন্যাসের মানুষেরা সরে যায় পেছনে। যেন বয়ন শিল্পের পরিসর মঞ্চে রূপান্তরিত এবং পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে ভূগোল ও ইতিহাসের বিভিন্ন পরিসরে কন্থকের উপর।"* [১৩]

প্রকৃতি যেমন মরণ ফাঁদ তৈরি করে তেমনি মানুষও অন্যের বিনাশের জন্য মারণাস্ত্র তৈরি করে। সেই অস্ত্র মানব সভ্যতার শত্রু হয়ে ওঠে। ১৯৪৫-এ হিরোশিমা-নাগাসাকিতে মারণাস্ত্র নিক্ষেপ মানব সভ্যতার পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠেছে। জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ধরনের সম্যসা থাকলেও তার থেকে উওরণের আকাঙ্ক্ষাও থাকে। মৃত্যু শোক ভরা এই পৃথিবীতে মানুষ বারে বারে ফিরে আসতে চায়। ঘোড়াটি নিজের ভুল বুঝেও ফিরতে পারেনি, তার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে অন্ধ হয়ে গেছে তবু চলা থামায়নি। তার মনে পড়ছিল আশ্বিনের কথা, কাশফুলের কথা, মেঘের কথা, জোৎস্নার কথা, গিরিমশায়ের ঘুড়ীটির কথা। তার অনুভবে জেগে ওঠে অতীত ইতিহাস-

> *"শুধু তার মাথার ভিতরে বুদ্ধদেবের মতো প্রেমময় চাঁদ ছিল। আলো ছিল। চাঁদ আর আলোর স্মৃতি ছিল। সমুদ্র ছিল, বাতাস ছিল, সবুজ তৃণভূমি ছিল। ছিল সেই রাজপুত্র যার মাথায় মাথায় চলত সোনালি রঙের মেঘ, শ্বেতকবুতর উড়ত যে-মেঘে, সেই মেঘের দিনগুলি স্মৃতিতে আছে। কন্থক মরে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াতে চাইছে।"* [১৪]

আজ আমাদের চোখের সামনে বিশ্ব করোনা মহামারি, তালিবান শাসন, পুঁজিপতিদের স্বৈরাচারিতা দেখতে পাচ্ছি। সেই সব দেখেও আমরা শ্রীপতি্র মতো মূক ও বধির। শ্রীপতি শুধুমাত্র নিজের দেড়শো বিঘা সম্পত্তির টাকার কথা ভাবে তাতে কোন মেয়েমানুষ ধর্ষিত হলো, লাইনে গেলো, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল তার খোঁজ সে রাখে না। সেই সাথে জমিও আর বাঁচাতে চায় না। কারণ সে জানে আর বেশিদিন দলিলবিহীন জমি ভোগ দখল করতে পারবে না। চাষিরা সেইসব জমিতে নিজের অধিকার বুঝে নেবে। অন্যদিকে শ্রীপতির প্ররোচনায় রামচন্দ্র সুভদ্রাকে সামাজিক স্বীকৃতি না দিয়ে তাকে শ্রীপতির কাছে রেখে যায়। সেই রাতে সুভদ্রা হোটেল ত্যাগ করে। আবার গৌরমোহন তার দিদি ঊষার সন্দোহ ও জামাইবাবু শিবরামের কোকিলার প্রতি লোলুপতার জন্য কোকিলাকে ত্যাগ করে। সুভদ্রা ও কোকিলা শেষপর্যন্ত সব কিছু মুখ বুঁজে সহ্য করেনি। মদরঞ্জিতে আঁকা ঘোড়ার চিত্র সুভদ্রা -কোকিলাকে সাহস জুগিয়েছে। এভাবে তারা পুরুষতন্ত্রের শোষক শ্রীপতি -শিবরামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় সত্যের জয়ধজ্বা।

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা বলতে পারি বহুকাল ধরে শাসক সম্প্রদায় তাদের ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। আর ভারতের মত সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা,স্বাস্থ্য, দারিদ্র, বেকারত্ব, শিশু শ্রম , শিশু মৃত্যু উপেক্ষিত হয়। আর অস্ত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে উসকে দেওয়া হয়। পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিষবাস্প সব কিছু বেসরকারিকরণ করে দিচ্ছে। আর সেই সাথে মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সুভদ্রা, কোকিলার মত নারীরা শেষপর্যন্ত সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। বর্তমান-অতীত -ভবিষৎ চক্রাকার পথের মাধ্যমে ভানুচরণের সাথে পরিচিত হওয়া নানা মানুষের মাধ্যমে আমাদের সামনে পরোক্ষভাবে বিশ্বপুঁজিবাদের চিত্র তুলে ধরেন। "অশ্বচরিত" বিরল গোত্রের ধ্রুপদী উপন্যাস যার চালচিত্র সমকালীন এই ভারতবর্ষ। এই উপন্যাস জীবন ও মৃত্যুর, প্রেমের-অপ্রমের। চিরকালের কথা বলতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র চারিদিকে মরণের বিষাক্ত বাতাসের মধ্যেও বাঁচার আলো দেখান।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'আখ্যানের স্বরান্তর',একুশ শতক, কলকাতা-৭০০০৭৩,২০০৭, পৃ-১৩২-১৩৩
২. মিত্র, অমর, "অশ্বচরিত", করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ-২০১৭, প্রচ্ছদ পট

৩. মজুমদার, সমীরণ, 'অমৃতলোক (৯৭)', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, অক্টোবর-মার্চ, ২০০২-২০০৩, পৃ-৩৩৫
৪. মিত্র, অমর, "অশ্বচরিত", করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ-২০০৭, পৃ-১
৫. মিত্র, অমর, "ছন্দক আর কন্থকের কথা" সুন্দর, বৈশাখ, ১৪০৭, পৃ- ১০৩
৬. মিত্র, অমর, "অশ্বচরিত" করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ-১৮৭
৭. তদেব, পৃ- ৯১
৮. তদেব, পৃ-৯৩
৯. তদেব, পৃ-১০২
১০. তদেব, পৃ-১০৫
১১. তদেব, পৃ-২৬১
১২. দাশ, জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা -৭৩, নবম-মুদ্রণ, ২০০১ পৃ-১১২
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'আখ্যানের স্বরান্তর', একুশ শতক, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৭, পৃ-১৪১
১৪. মিত্র, অমর, "অশ্বচরিত", করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ-৩০৪